বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ১৪৯-১৬৫
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

উন্নয়ন ভাবনায় বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বনাম মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি: একটি পর্যবেক্ষণমূলক পর্যালোচনা

মুহাম্মদ জসীম উদ্‌দীন*

সারসংক্ষেপ *আলোচ্য প্রবন্ধে টেকসই উন্নয়নের প্রতিবন্ধক হিসেবে একটি মৌলিক বিষয় মানবিকতাকে উপেক্ষা করে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের কুপ্রভাব এবং একই সাথে বিশ্বব্যাপী প্রকৃত টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চাইলে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধের শুরুতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তথ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আধুনিক বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির উৎস এবং এর প্রসার, বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের নেতিবাচক দিক—এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী প্রকৃত ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবন্ধের শেষাংশে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।*

মূল শব্দ *উন্নয়ন, আধুনিক বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি, লোভ, লালসা, মুনাফা, বৈষম্য, বিশৃঙ্খলা, মনুষ্যত্ববোধ, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো।*

১. ভূমিকা

এ কথা না বলার কোনো উপায় নেই যে, বিশ্ব এগিয়ে চলছে তো চলছেই। দিন যত গড়াচ্ছে, এগিয়ে যাওয়ার গতি ততই বাড়ছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, তথ্যপ্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আধুনিকতা, চাকচিক্য, দৃষ্টিনন্দন আধুনিক স্থাপনা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি অসংখ্য ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণ করার কোনো অবকাশ নেই। প্রশ্ন হলো এ উন্নয়নের মূলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? বাণিজ্যিক? নাকি মানবিক? এর সহজ উত্তর আমাদের এই অগ্রগতির কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে বাণিজ্যিক মনোভাব বা বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি। অন্য কথায় বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি এই বিশ্বকে দেখি তাহলে বলতে হবে বিশ্ব দ্রুত এগিয়ে চলছে। কিন্তু মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় আমাদের কোনোই অগ্রগতি নেই। আরও সহজ করে বললে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় যেমন দ্রুত এগিয়ে চলছি, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করলে আমরা তেমনি পিছিয়ে যাচ্ছি।

* সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, সিলেট ক্যাডেট কলেজ, সিলেট; ফোন: ০১৭১২-৬১৩০৯৭, ই-মেইল: jasim_uddin90@yahoo.com

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ২০তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন-২০১৭-এ পঠিত, ২১-২৩ ডিসেম্বর ২০১৭।

বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে খানিক আলোচনা করা যাক। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল বিবেচ্য বিষয় হলো অর্থ, অর্থের প্রতি লোভ, লালসা, মুনাফা, স্বার্থ, স্বচ্ছলতা, বিলাসিতা ইত্যাদি। আর এ সবকিছু অর্জনে আমরা মেধা ও মননে লালন করি দুর্বৃত্তপনা, হিনমন্যতা, পেশীশক্তি, পাষবিকতা ইত্যাদি। অপর পক্ষে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মূলে অর্থের স্থান নগণ্য। অর্থের চেয়ে মানবতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা বোধ, অন্যের বিপদে এগিয়ে আসা ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রধান্য পায়।

একজন মানুষের মধ্যে বাণিজ্যিক ও মানবিক উভয় দৃষ্টি ভঙ্গির সংমিশ্রণ থাকা স্বাভাবিক। এদুয়ের মধ্যে যাদের কাছে অর্থই সবকিছুর উর্ধ্বে বিবেচিত তারা বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন। অন্যদিকে যাদের কাছে অর্থের চেয়ে মানবতা, সহমর্মিতার গুরুত্ব বেশি তারা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন। একজন বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ বাস্তববাদী হয়। সবকিছুই সে বাস্তব জ্ঞান দ্বারা মূল্যায়ন করে। অপরপক্ষে একজন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ আবেগতাড়িত। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ বাস্তব জ্ঞান, বাস্তবতা দ্বারা সমাজকে উপলব্ধি করে এবং তা দ্বারা প্ররোচিত হয়। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়। বাস্তবতা তাকে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারে না। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ চরম স্বার্থপর, অর্থলিপ্সু হয়। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে মানবতাবাদী ও আবেগপ্রবণ করে গড়ে তোলে। পৃথিবীতে বাস্তববাদী মানুষের সংখ্যা নগণ্য। সে তুলনায় আবেগতাড়িত মানুষের সংখ্যা অসংখ্য, অগণিত। উন্নয়ন, অগ্রগতি যা-ই বলি না কেন—কেবল বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় হওয়া কাঙ্ক্ষিত নয়। মানবিকতাকে উপেক্ষা করে উন্নয়ন হলে সমাজে অস্থিরতা, মারামারি, হানাহানি, বৈষম্য, বিভেদ, বিশৃঙ্খলা, বিভাজন বাড়তেই থাকবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমরা এগিয়ে গেছি বলে যতই দাবি করি না কেন? সমাজ থেকে অশান্তি, অসাম্য দূর করা সম্ভব হবে না। বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতার দিকে তাকিয়ে আমরা এই সত্যটিই দেখছি। বিশ্ববাসীর দুর্ভাগ্য—এই যুগে যে উন্নয়ন সংগঠিত হচ্ছে, তার মূলেই রয়েছে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি। মানবতার স্থান এতে নেই বললেই চলে।

বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে চরম স্বার্থপর করে গড়ে তোলে। এ স্বার্থের কাছে অর্থকড়িই সব। বিবেক, বিবেচনা, মনুষ্যত্ববোধ—এই স্বার্থের কাছে বিসর্জিত, উপেক্ষিত। সহযোগিতা, সহমর্মিতাসহ এ জাতীয় মানবিক গুণের এই স্বার্থের কাছে কোনো স্থান নেই। মানবিক গুণগুলো বিসর্জন দিয়ে অর্থ উপার্জনের সংস্কৃতি এ সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সবকিছু অর্থ দিয়ে মূল্যায়ন করা এ এক ভয়ংকর সংস্কৃতি। একজন মানুষের মানবিক গুণ থাকা অত্যাবশ্যক। সত্য হলো বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির কাছে মানবতা আজ নির্বাসিত। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি এমন কোনো কুকর্ম নেই, যা মানুষকে দিয়ে করাতে প্ররোচিত করে না। এখানে অর্থই সব। অর্থের কাছে সবকিছু জিম্মি। সবার উপরে স্থান পায় অর্থ। সবকিছুই অর্থের মানদণ্ডে বিবেচনা করা হয়। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃত রূপ এতই কদাকার যে, এটি বিশ্বব্যাপী নারীর সৌন্দর্য্যকেও পণ্যে রূপান্তর করেছে। বাণিজ্যিক স্বার্থে নগ্নতা, যৌনতাকে সহজলভ্য ও সুলভ করে তুলছে। যুবসমাজকে বিপথগামী করে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে ভুল মানসিকতাকে ব্যবহার করা হচ্ছে আজ মুনাফা অর্জনের পণ্য হিসেবে, আর এতে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে দেদারছে।

যদি প্রশ্ন করা হয় বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতিকে কেন সমূলে উৎপাটন করা যাচ্ছে না? কেন দারিদ্র্য দূরীকরণ করা সম্ভব হচ্ছে না? কেনই বা আজকের যুগের সবচেয়ে সহজতম কাজ—সব মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব হচ্ছে না? পোশাককর্মীদের জীবনমান উন্নত করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন? পাথরশ্রমিক, চা-শ্রমিকেরা কেন অযৌক্তিক মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন? বিশ্ব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এই চরম সভ্যতার যুগে বিশ্বব্যাপী এত যুদ্ধ কেন? কেন দিনের পর দিন নতুন নতুন সংকট তৈরি হচ্ছে? বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা

সমস্যা কেন ক্রমশই প্রকট আকার ধারণ করছে? এককথায় এর উত্তর হচ্ছে—বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার। বাণিজ্যিক মনোভাব শিক্ষিত, স্বচ্ছল, সচেতন নামধারী মানুষদের গ্রাস করে ফেলছে। আর এর পরিণতিতেই পৃথিবীজুড়ে এত অস্থিরতা, অরাজকতা, বৈষম্য, বিভেদ, হানাহানি। ড. আবুল বারকাত ২০১৪ সালের এক লোকবক্তৃতায় Rent Seekers-এর কথা উল্লেখ করেছেন। আমাদের সমাজে দুর্নীতিবাজ, চাঁদাবাজ, ছিনতাইকারী, দখলবাজ, লুটেরা, কালোবাজারী, প্রতারক, দালাল যারা অনৈতিকভাবে অর্থ উপার্জন করে রাতারাতি বিপুল অর্থ-বিত্তের মালিক বনে যায়, তাদেরই তিনি তাঁর লোকবক্তৃতায় Rent Seekers হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই Rent Seeker-রা সম্পদ তৈরি করে না, অন্যের সম্পদ হরণ করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। এই Rent Seekers তৈরি হওয়ার প্রধান কারণ বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার।

বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসার্যমাণ। আর এটিই বিশ্ববাসীর জন্য এক ভয়াবহ বিপৎসংকেত। এ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে প্রসারিত হচ্ছে ক্রমশ। বিশ্বব্যাপী ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে, যাকে আমরা উন্নয়ন বলে চলছি। কিন্তু এ উন্নয়ন একপেশে। মানুষের মানবিক গুণগুলোকে বিসর্জন দিয়ে, উপেক্ষা করেই এ উন্নয়ন হচ্ছে। প্রকৃত বিবেচনায় এটি কোনো উন্নয়নই নয়।

আজকের বিশ্বায়ন ধারনাটি বাণিজ্যতন্ত্রের চরম বিকাশমান রূপ। বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় উন্নত অনুন্নত কোনো দেশই বিশ্বায়নপ্রক্রিয়ার বাইরে নয়। বিশ্বায়নপ্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে দরিদ্র দেশগুলো এগিয়ে যাওয়ার নিরন্তর চেষ্টা করে চলছে। কিন্তু বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার যে প্রস্তুতি বা যে কাঠামোগত অবস্থান থাকা বাঞ্ছনীয়, তা না থাকায় দরিদ্র দেশগুলোতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে বলে মনে হচ্ছে না। আর দরিদ্র দেশগুলোতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত না হলে বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার চিন্তা অযৌক্তিক। আমাদের দেশের তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়নের কথাই বলি। বিবেচনা করি বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির বিষয়টি। গত ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে রিজার্ভের অর্থ চুরি হয়। ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে ফিলিপাইনের ইনকোয়ার নামক পত্রিকায় এ বিষয়ে প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এত বড় একটি ঘটনা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। ফিলিপাইনের পত্রিকার বদৌলতে বিষয়টি জানাজানি হয়। তথ্য গোপন করার পরিণতিতে গভর্নর আতিউর রহমান ১৫ মার্চ, ২০১৬ তারিখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তদন্তের জন্য বাংলাদেশের সিআইডি, এফবিআইসহ বেশ কয়টি সংস্থা কাজ করে। সাবেক গভর্নর ফরাসউদ্দিনের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এ ঘটনার জন্য সুইফটকে দায়ী করে। সুইফট তা অস্বীকার করে উল্টো বলেছে, এতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তারাই জড়িত। বাংলাদেশ ব্যাংকের কয়েকজন কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, বরখাস্ত করা হয় কয়েকজনকে। তার মানে বিভ্রান্তি কাকে বলে? আরও আশ্চর্যজনক তথ্য হলো ঘটনা ঘটার ১০ মাসের অধিক সময় পরে তৎকালীন গভর্নর ড. আতিউর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো সুরক্ষিত জায়গা থেকে অর্থ চুরির ঘটনা অত্যন্ত লজ্জাজনক, অপমানকর, অবমাননাকর। এতে এ দেশের জনস্বার্থকে উপেক্ষা করা হয়েছে। এখানে সন্দেহ পোষণ করার কোনো সুযোগ নেই। যে যার মতো করে কথা বলে চলছে। এসব রসিকতা নয় কি? এ ঘটনায় প্রমাণ হয়, প্রযুক্তিজ্ঞানে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। নৈতিকতায় নয়। নৈতিকতা ব্যাতিরেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান বা তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন মানুষের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনতে পারে না। রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনা বলে দেয় যে আমরা বিশ্বায়নের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছি। এভাবে চলতে থাকলে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে আমাদের মতো দরিদ্র দেশগুলোতে কোনো সুস্থধারার রাজনীতি থাকবে বলে মনে হয় না। সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম, আইন, শিক্ষা—সবই বিশ্বায়নের পদতলে অবদমিত হতে থাকবে। সত্য উদ্‌ঘাটন কঠিন হয়ে উঠবে। আজকের যুগে বিশ্বায়ন বাণিজ্যতন্ত্রের শিকলে বন্দী হয়ে টেকসই উন্নয়নের কথা বলে উন্নয়ন ধারনাকে মূলত বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে। বিশ্বায়নের গতিপ্রকৃতি তা-ই জানান দিচ্ছে।

বিশ্বায়নপ্রক্রিয়ার সুফল পেতে হলে বিশ্বনেতাদের বিশ্ববাসীর প্রতি প্রতিশ্রুতি ও দায়বদ্ধতা থাকা চাই। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ককে দরিদ্র দেশগুলোর অভুক্ত মানুষদের প্রতি যে দরদ, মমত্ববোধ থাকা প্রয়োজন, তা কি আছে? সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশের রাষ্ট্রনায়কের দরিদ্র দেশগুলোর প্রতি যে প্রতিশ্রুতি দায়বদ্ধতা থাকা বাঞ্ছনীয় তা কি আমরা দেখতে পাচ্ছি? বাস্তবে দায়বদ্ধতার বিপরীতে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে দেখছি। হতাশাজনক সত্য—দিন যতই যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী দরিদ্র শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের দুর্দশা বেড়েই চলছে। সারা বিশ্বে নিরাপত্তা সমস্যাটি দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। বাণিজ্যিক স্বার্থসিদ্ধিই রয়েছে এর মূলে। উন্নত দেশগুলোর বাণিজ্যিক স্বার্থ উদ্ধারের নেশার কারণেই দেশে দেশে কোটি কোটি মানুষের চরম আতঙ্ক, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় দিন কাটাতে হচ্ছে। ৯/১১-এর পর সন্ত্রাসবাদ উন্নত দেশগুলোর জন্য চরম হুমকি বলে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। বস্তুত এই সন্ত্রাসবাদ অনুন্নত দরিদ্র দেশগুলোর জন্য ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনছে। এ কি সত্য নয়?

বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি আজ এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, একজন মানুষ অর্থ উপার্জন করে কী করছে মানুষ তা-ই দেখে। কাড়ি কাড়ি অর্থের বদৌলতে সমাজে রাতারাতি অবস্থান তৈরি করা যায়, প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় সহজেই। কী উপায়ে ব্যক্তি উপার্জন করে, সমাজ তা পরখ করে না। এ সংস্কৃতি প্রসারের ফলে বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা বেড়েই চলছে। জ্যামিতিক হারের চেয়ে বেশি হারে বেড়ে চলছে বৈষম্য, শোষণ, বঞ্চনা। এ বঞ্চনার শেষ কোথায় কেউ বলতে পারে বলে মনে হয় না। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির বেড়াজালে কূটনীতি দিনে দিনে দুর্বোধ্য ও জটিল হয়ে পড়ছে। কূটনীতির জটিলতার কঠোর সমীকরণে পড়ে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন থমকে আছে। তৈরি হচ্ছে জটিল জটিল সমস্যা। সমস্যা থেকে সংকট। আজকের বিশ্বকে আলাদা আলাদাভাবে দেখলে অজস্র সংকট চোখে পড়ে। আর এককভাবে বিবেচনা করলে পৃথিবীতে সংকট একটাই, আর তা হলো—বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার। আরও সহজ করে বলা যায়, সব সংকটের কেন্দ্রবিন্দু হলো বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি। পৃথিবীতে সব সময়েই সংকট ছিল। সংকট থেকে মুক্তিও মিলেছে। কিন্তু আগে কোনো সময়েই সংকটের মূলে বাণিজ্যিক স্বার্থ ছিল বলা যাবে না। আজকের যুগে বাণিজ্যিক স্বার্থে যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে। এর মানে দাঁড়ায়, এ যুগে যুদ্ধও একধরনের পরিকল্পিত বিনিয়োগ। বাণিজ্যিক স্বার্থের মোড়কে আবদ্ধ এই সংকট থেকে বিশ্ববাসীর মুক্তির উপায় কী? কিংবা এই সংকট থেকে আদৌ মুক্তি মিলবে কি? বলা মুশকিল।

কেবল লাগামহীন মুনাফা অর্জন একজন ব্যবসায়ীর মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। মুনাফা লাভের পাশাপাশি মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকাও জরুরি। তেমনি একজন শিল্পমালিকের শ্রমিকদের প্রতি দায়িত্ববোধ ও দায়বদ্ধতা থাকা বাঞ্ছনীয়। পেটের দায়ে শ্রমিকেরা তার কারখানায় কাজ করেন। সেই শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন তথা তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করার দিকে খেয়াল দেওয়া উচিত। জ্ঞাননির্ভর ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে আমাদের মনোভাব তা-ই হতে হবে। প্রশ্ন হলো—একদিকে মুনাফা, আরেক দিকে দায়বদ্ধতা—বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কোন দিকে প্ররোচিত করে? নিশ্চয়ই মুনাফার দিকে।

সুতরাং কেবল বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারে মানুষের কল্যাণ হওয়ার কথা না। কল্যাণ একটি গুণগত ধারনা। এ যুগে প্রতিটি রাষ্ট্রই কল্যাণরাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে চায়। প্রতিটি রাষ্ট্রই নিজের উন্নয়নকে টেকসই উন্নয়ন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু প্রকৃত বিবেচনায় তা করতে পারছে কি? মানুষের প্রকৃত কল্যাণ নিশ্চিত করতে চাইলে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটাতে হবে। বর্তমান বিশ্ববাস্তবতায় মানবিকতাকে বিসর্জন দিয়ে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের যে নিরন্তর প্রচেষ্টা, তা থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসতে হবে। আগে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তারপর বাণিজ্যিকতার কথা ভাবতে হবে। তবেই গণমানুষের মঙ্গল। তবেই দেশ ও জাতির কল্যাণ। তবেই হবে প্রকৃত ও টেকসই উন্নয়ন।

আলোচ্য প্রবন্ধে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির কুফল নিয়ে আলোচনা করার প্রচেষ্টা থাকবে। একই সাথে বিশ্বমানবতার মুক্তি তথা দরিদ্র, শ্রমজীবী গণমানুষের উন্নতির লক্ষ্যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করার প্রয়াস থাকবে।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের মধ্য দিয়ে আজকে যে উন্নয়নের কথা আমরা বলছি তার স্বরূপ উন্মোচন করা। একই সাথে টেকসই ও কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে উদ্দেশ্যগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

১. আধুনিক বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের উৎস খুঁজে বের করা।
২. বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের ফলে বিশ্ববাস্তবতায় নেতিবাচক দিকগুলোর ওপর আলোকপাত করা।
৩. প্রকৃত ও টেকসই উন্নয়নে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের গুরুত্ব তুলে ধরা।

৩. তথ্য ও পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যসমূহ মাধ্যমিক উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বাংলাদেশ অর্থনীতির সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত জার্নাল, বিভিন্ন গ্রন্থ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাপিডিয়া, ইন্টারনেট, বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন ও প্রবন্ধের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর লেখকের অভিজ্ঞতার আলোকে লব্ধ কতিপয় পর্যবেক্ষণের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৪. আধুনিক বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির উৎপত্তি এবং প্রসার

আধুনিক বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির যে রূপ বিশ্বব্যাপী দেখে চলছি, তা কখন কোথায় কীভাবে উৎপত্তি লাভ করেছে তা নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। সমাজ সবসময়ই পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের কোন পর্যায়ে তার ভিত রচিত হয় তা সুনির্দিষ্ট করে বলার সুযোগ নেই। বাণিজ্যিকতা, বাণিজ্যিক স্বার্থ সবসময়ে সব সমাজেই ছিল। ১৪৯২ সালের কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার বিশ্ব পরিবর্তনে গতি সঞ্চার করে। পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে ১৪৯২ সাল পর্যন্ত পৃথিবী পরিবর্তিত হয়েছে ধীর গতিতে। কিন্তু ১৪৯২ সাল থেকে এই বর্তমান সময় পর্যন্ত এই ৫০০ বছরের পরিবর্তন হয়েছে বৈপ্লবিক হারে যা অকল্পনীয়, নজিরবিহীন।

এই সময়ের মধ্যে ধ্যান-ধারনা, শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তির উন্নয়নসহ সব ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে এই পরিবর্তনের গতি আরও দ্রুততর হচ্ছে। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পেছনে কেবল বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ছিল বলা যাবে না। কিন্তু তার এই আবিষ্কার ইউরোপীয় বেনিয়াদের নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। ইউরোপীয় বণিকসমাজ সমুদ্র জয়ের নেশায় মেতে ওঠে। অল্প সময়ের ব্যবধানেই সমুদ্রপথে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য শুরু করে দেয়। আধুনিক নামধারী বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা সম্ভবত এখান থেকেই। এই বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভর করে পৃথিবীতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন হয়েছে বলা হচ্ছে। কিন্তু এ উন্নয়নের বুকে রয়েছে এক বিরাট ভয়ানক ক্ষত। আর এ ক্ষত পৃথিবীব্যাপী প্রকৃত উন্নয়নের পথে হিমালয়ের মতো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পৃথিবীতে অগণিত আইন প্রণীত হয়েছে, হচ্ছে। আইন প্রণীত হবে গণমানুষের স্বার্থে, গণমানুষের কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে। তাত্ত্বিকভাবে জনস্বার্থে আইন প্রণীত হচ্ছে বলা হলেও সব ক্ষেত্রে তা কি হচ্ছে? বাংলাদেশের কথাই বিবেচনা করি। এ দেশের সব আইনে জনস্বার্থ প্রতিফলিত হচ্ছে না, এমনকি জনস্বার্থে বাস্তবায়নের হারও কম। হাইকোর্টে কত শত শত রিট হচ্ছে। প্রশ্ন হলো এত শত শত রিটের মধ্যে দরিদ্র শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের স্বার্থে কতটি রিট হয়?

মানবিক মূল্যবোধকে প্রধান্য দিয়ে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হলে বিশ্বব্যাপী প্রকৃত উন্নয়ন তথা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হতো। কিন্তু বর্তমান বিশ্ববাস্তবতার দিকে তাকালে এ কথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, মানবিক মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটছে, ঘটে চলছে। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হলেও সামাজিক সূচকের দিক থেকে বিশ্ব ক্রমাগত পিছিয়ে চলছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকের ক্ষেত্রে ব্যাপক ফাঁক ও অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হচ্ছে। পৃথিবীতে যত সংকট তৈরি হচ্ছে, তার মূলে এই অসামঞ্জস্যতাই দায়ী। তাহলে কি বাণিজ্যিকতাকে শতভাগ উপেক্ষা করেই মানবিকতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অবশ্যয়ই না। বাণিজ্যকতাকে উপেক্ষা করে নয়। বাণিজ্যিকতা ও মানবিকতাকে পাশাপাশি চলতে দিতে হবে। এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে উন্নয়নকে প্ররোচিত করতে হবে। নতুন করে উন্নয়নের পথ খুঁজতে হবে যেখানে বাণিজ্যিকতার চেয়ে মানবিকতার গুরুত্বই থাকবে বেশি।

মানবসভ্যতার শুরু থেকে আজ অবধি হাজারও তত্ত্ব ও পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে, বাস্তবায়িত হয়েছে; যা সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে বাণিজ্যিকতার দাপটে পৃথিবীতে অনেক কার্যকর প্রভাবশালী তত্ত্ব প্রবর্তিত হয়েছে যার ফলে এই কয়েক শতকে পৃথিবীতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ইউরোপের রেঁনেসা সারা ইউরোপজুড়ে যে জাগরণ সৃষ্টি করেছে তার ব্যাপকতা সম্পর্কে আমরা জানি। রেনেসাঁর অগ্রদূতগণের কী উদ্দেশ্য ছিল তা সুনির্দিষ্ট করে বলা যাবে না হয়তো। তবে এটুকু বলা যায় রেনেসাঁর অগ্রদূতগণ সম্ভবত একটি সুন্দর, শান্তিময়, বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ার প্রত্যয় নিয়ে এর সূত্রপাত করেছিলেন। রেনেসাঁর মূল কথা ছিল মানবকল্যাণ, গণমানুষের মুক্তি। ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত সামন্তবাদের জাঁতাকলে পিষ্ট হওয়া গণমানুষের মুক্তির মধ্য দিয়ে এর সূত্রপাত। কিন্তু অচিরেই বাণিজ্যিকতা সে চেতনা গ্রাস করে নেয়। রেনেসাঁর প্রভাব বাণিজ্যিকতার জালে আটকা পড়ে। ভূমিভিত্তিক সমাজকাঠামো ভেঙে শিল্পভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক চেতনা বণিক সমাজের ভোগ-বিলাসিতার মাধ্যমে পরিণত হয়। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসার লাভ করে এভাবেই। ইউরোপজুড়ে ব্যাপক পরিবর্তন হয়। মানুষ মানবতাবাদী না হয়ে বাণিজ্যিক স্বার্থে অন্ধ হয়ে ওঠে। বাণিজ্যই হয়ে ওঠে সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু। বাণিজ্যতন্ত্রের কুপ্রভাব কেবল ইউরোপজুড়ে নয় বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হয়। মানুষের মুক্তির জন্য যে চেতনার সূত্রপাত, মানবতার জয়গানের যে জাগরণের প্রসার হতে লাগল, বাণিজ্যতন্ত্র মুহূর্তেই তা গ্রাস করে ফেলল। কেবল রেনেসাঁর অগ্রযাত্রা নয়, বাণিজ্যতন্ত্রের কাছে পুরো বিশ্ব, বিশ্বরাজনীতি, দর্শন, শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা আজ শেকলবন্দী।

১৮৪৮ সালে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো উপনিবেশবাদী শক্তির ওপর পদাঘাত করে এবং তার আঘাতে উপনিবেশবাদ ক্ষয়িত হতে থাকে। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশের পরপরই বিশ্বব্যাপী উপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চেতনার প্রসার ঘটতে থাকে। দেশে-দেশে গড়ে ওঠে রাজনৈতিক দল। এসব দলের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত হয় এবং দেশে-দেশে স্বাধীনতার আন্দোলন গড়ে ওঠে। পরিণতিতে উপনিবেশবাদের পতন ঘটতে থাকে। একের পর এক দেশ স্বাধীন হতে থাকে।

১৯২০-এর দশকের শেষ ভাগে মহামন্দা মোকাবিলায় সামষ্টিক অর্থনীতির সূত্রপাত হয়, যা মন্দার কবল থেকে বিশ্ব অর্থনীতিকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়। এভাবে হাজারও তত্ত্ব, পদ্ধতি, নিয়ম-বিধি, আইন, যুদ্ধ-বিগ্রহ পৃথিবীতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে চলছে। অর্থনীতিতে উৎপাদন সর্বোচ্চকরণ তত্ত্ব বাদ দিয়ে যখনই মুনাফা সর্বোচ্চকরণ তত্ত্ব গ্রহণ করা হয়, তখন থেকেই বিশ্বমানবতা, মানবিকতা, মনুষ্যত্ববোধের পতন ঘটতে থাকে। আজকের সময়ে যা শূন্যের কোঠায়। সুতরাং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির বিবেচনায় মুনাফা সর্বোচ্চকরণ তত্ত্ব আজ চরম বিতর্কের মুখোমুখী। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপূর্ণতা দিতেই মুনাফা সর্বোচ্চকরণ তত্ত্বের উদ্ভব। এই মুনাফা সর্বোচ্চকরণের জন্য বিক্রেতা/উৎপাদনকারীরা কি-ই-না করে চলছে। অসম প্রতিযোগিতা, অনৈতিক কার্যকলাপ, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা, দাম বাড়ানো, ভেজাল পণ্য উৎপাদন, সিন্ডিকেট, শ্রমিকদের ন্যায্যমজুরি থেকে বঞ্চিত করা, শোষণ, নিপীড়নসহ এমন কোনো অপকর্ম নেই, যা মুনাফা সর্বোচ্চ করতে বিশ্বব্যাপী ঘটছে না। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির সর্বগ্রাসী রূপ আজ মুনাফা সর্বোচ্চকরণ তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে।

৫. বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির নেতিবাচক দিক

সমাজের সাধারণ মানুষেরা সহজ সরল, নিরীহ। এরা অন্যের ক্ষতি করতে আগ্রহী নয়, কঠোর পরিশ্রম করে, দিনরাত শরীরের ঘাম ঝরিয়ে যাচ্ছে। দুঃখজনক সত্য এই শ্রমজীবী সাধারণ মানুষেরা স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপন করতে পারছে না। সারা পৃথিবীব্যাপী এই একই চিত্র। কতিপয় মানুষ বুদ্ধির জোরে অন্যের অধিকার হরণ করে বিলাসী জীবনযাপন নিশ্চিত করছে। রাষ্ট্র, আইন, সরকার, সমাজ—সবই এই অল্পসংখ্যক দুর্বৃত্তদের পক্ষে। পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ নীরিহ মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের দিকে কেউ তাকায় না। বাণিজ্যতন্ত্রের প্রকৃত শিক্ষা এটাই।

বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের ধ্যান-ধারনাকে অর্থকেন্দ্রিক করে তোলে, যা অনৈতিক ও অযৌক্তিক। আজ বিশ্বব্যাপী যে অজস্র সংকট তৈরি হচ্ছে, তার প্রধান কারণ এই বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের সুষ্ঠু চিন্তা বিকাশের এক বিরাট বাধা। মানুষের মেধা ও মননে এক ভয়ানক প্রতিবন্ধক। এককথায় বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি মানবকল্যাণ ব্যাহত করে, ক্ষতিগ্রস্ত করে। শিক্ষিত মানুষ মানে আলোকিত একজন মানুষ। একজন শিক্ষিত মানুষকে হওয়া চাই সৎ, আদর্শ ও সুবিবেচক নাগরিক। অসংখ্য শিক্ষিত মানুষ এ দেশের প্রশাসন, রাজনীতি, গণমাধ্যমসহ সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। প্রশ্ন হলো কতজন শিক্ষিত মানুষ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন যে, তিনি শতভাগ সৎ। এ কথা ধ্রুবসত্য যে, উন্নয়নের জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু শিক্ষিত মানুষের নৈতিকতাবিরোধী, আইনবহির্ভূত, বিবেকবর্জিত কার্যকলাপ দেখে হতাশ হতে হয়। শিক্ষিত সমাজের একটি অংশের অর্থের মোহ, জালিয়াতি, অনিয়ম, অনাচার, দুর্নীতি দেখে হতবাক হয়ে যেতে হয়। বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের একজন কর্মকর্তার কথা বিবেচনা করা যাক। জনপ্রশাসনের একজন কর্মকর্তা প্রজাতন্ত্রের একজন কর্মচারী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন জনস্বার্থে, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা, আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নে নিরলস কাজ করার জন্য। প্রজাতন্ত্রের একজন কর্মচারী হিসেবে এ দেশের কতজন কর্মকর্তা তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রমাণ করছেন যে, তিনি মানুষের জন্য মানবকল্যাণে নিবেদিত। জনপ্রশাসনের একজন কর্মকর্তার সাথে এ দেশের সাধারণ মানুষের ন্যূনতম কোনো যোগাযোগ থাকে কি? দুর্নীতি এ দেশে এক ভয়াবহ ব্যাধি। বলা হয়—এ দেশের রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যবসায়ী—এই তিন শ্রেণি আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। দুর্নীতি করে রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ বনে যায়। আর ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষ, ক্ষতিগ্রস্ত হয় পুরো দেশ ও জাতি। প্রচলন আছে, একজন দুর্নীতিবাজের কাছে মা-বাবা, ভাইবোন

বলে কিছু নেই। সুযোগ পেলে বাবার সাথেও সে দুর্নীতি করে। দুর্নীতি দেশের উন্নয়নকে অবরুদ্ধ করে রাখছে। এ দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে প্রতিবছর বিপুল অংকের অর্থ ব্যয় করা হয়। গত ১০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ ছিল ১ লাখ ১০ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। এ বিপুল পরিমাণ অর্থ উন্নয়নে ভারসাম্য ও উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের কথা বলে ব্যয়িত হলেও বাস্তবে এ অর্থের সিংহভাগ রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যবসায়ী, ছাত্রনেতা, ঠিকাদার, জনপ্রতিনিধিদের পকেটে চলে যাচ্ছে। এ যেন দেখার কেউ নেই। দরিদ্র মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন তথা ভাগ্য উন্নয়নের কথা বলে প্রতিবছর সামাজিক নিরাত্তাবেষ্টনির অসংখ্য কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। গত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৩৭ হাজার ৫৪৬ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১২.৭২ শতাংশ এবং জিডিপির ২.১৯ শতাংশ। এসব কর্মসূচির সামান্য অংশই প্রকৃত সুবিধাভোগীরা পায়। এসব বরাদ্দ যত-না হয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন বা দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে, তার চেয়ে বেশি হয় দুর্নীতি করার জন্য। কেবল বাংলাদেশ নয় দুর্নীতি আজ বিশ্বব্যাপী মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। এর নেপথ্যে রয়েছে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের ফলেই পৃথিবীব্যাপী দুর্নীতির মহোৎসব। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের ফলেই এ দেশে একাধিকবার শেয়ারবাজারে কেলেঙ্কারির মতো ঘটনা দেখতে হয়। একটি চক্র শেয়ারবাজারে কৃত্রিমভাবে শেয়ারের দাম বাড়িয়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের নিঃস্ব করে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেয়। ডেসটিনির মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে কত নিখুঁতভাবে মানুষের মগজ ধোলাই করে বোকা বানিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটে নেয়। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের ফলেই নির্মাণকাজে রডের পরিবর্তে বাঁশ ব্যবহার করার মতো অদ্ভুত অনৈতিক ঘটনা ঘটছে। নারায়ণগঞ্জের সাত খুনের ঘটনার মতো লোমহর্ষক বর্বর ঘটনা সম্পর্কে আমরা সবাই কমবেশি অবহিত। ২০১৪ সালের ২৭ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সাবেক প্যানেল মেয়র নজরুল ইসলামসহ সাত জনকে একসঙ্গে অপহরণ এবং পরে হত্যা করে লাশ গুম করার সাথে র‍্যাব-১১ এর অধিনায়ক, র‍্যাব - ১১ এর উপ-অধিনায়ক, র‍্যাব-১১ এর সিপিসিসহ পুরো একটি ইউনিট সম্পৃক্ত হয়ে পরে। ১৬ জানুয়ারি, ২০১৭ ইং তারিখে এই মামলার রায়ে আলোচিত সাত খুনের ঘটনায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের সংশ্লিষ্টতাকে 'জাতির জন্য অত্যন্ত কলঙ্কজনক', 'সকল সরকারি কর্মচারীর জন্য লজ্জাজনক' বলে উল্লেখ করেছেন আদালত। 'এ ঘটনা আমাদের সকলের মাথা লজ্জায় নুইয়ে দিয়েছে' উল্লেখ করে রায়ের পর্যবেক্ষণে আদালত বলেছেন, নূর হোসেন মূল পরিকল্পনাকারী (মাস্টারমাইন্ড)। র‍্যাব সদস্যরা তাঁর সঙ্গে মিলে যৌথভাবে (জয়েন্টভেঞ্চার) এই অপরাধ ঘটিয়েছেন (প্রথম আলো, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৭)। এই কলঙ্কজনক ঘটনার মূল কারণ কী? এককথায় এর উত্তর—অর্থের প্রতি মোহ। কেবল অর্থের মোহে পড়ে নূর হোসেনের মতো একজন আপাদমস্তক দুর্বৃত্তের কাছে র‍্যাবের একটি পুরো ইউনিট বিক্রি হয়ে যায়। সত্যিই, অর্থের মোহে মানুষ কি-ই-না করতে পারে!

ইউরোপীয় বেনিয়ারা দেশের পর দেশ দখল করে ঐসব দেশের সম্পদ লুণ্ঠণ করে নিতে থাকে। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সংগঠিত কোম্পানি দখলকৃত দেশগুলোর ওপর প্রবল প্রতাপশালী রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত হয়। ফলে ঐসব দেশে তারা বাণিজ্যিক স্বার্থে লুণ্ঠনের সাংস্কৃতি চালু করে। লুণ্ঠনের এই সাংস্কৃতি সহজতর করতে অর্থের প্রচলন করে অর্থকে জনপ্রিয় করে তোলে। অর্থের প্রচলন করে সম্পদ লুণ্ঠনের সাথে সাথে অর্থ লুণ্ঠন শুরু করতে থাকে। সম্পদ, অর্থ লুণ্ঠন করেই ক্ষান্ত হয়নি। বাণিজ্যিক স্বার্থ সর্বোচ্চকরণ করতে এর পাশাপাশি তথ্যলুণ্ঠন শুরু করে। কোন দেশের কত আয়তন, জনসংখ্যা, সমাজকাঠামো, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, মানুষের ধ্যানধারনাসহ কোথায় কী সম্পদ আছে—সবধরনের তথ্যই লুণ্ঠন করে নিতে থাকে। আর এসব তথ্যের ওপর তাদের পররাষ্ট্রনীতি, কূটনীতি ঢেলে সাজায়। কূটবুদ্ধির

জালে বন্দী হয়ে কূটনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে হাতছাড়া হয়ে গেলেও দখলকৃত দেশগুলোর ওপর প্রভাব-প্রতিপত্তি তেমনি রয়ে গেছে, যার দ্বারা তাদের সম্পদ, অর্থ, তথ্য লুণ্ঠন করে চলছে এখনো। চরম সত্য হলো উন্নত বিশ্বজুড়ে আজকে যে সমৃদ্ধির অর্থনীতি দেখে আমরা অভিভূত হই, প্রকৃত অর্থে সেটি লুণ্ঠনের অর্থনীতি। সারা বিশ্বের সম্পদ, অর্থ, তথ্য লুণ্ঠন করে তাদের সমৃদ্ধির সোপান তৈরি করছে।

বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের ফলেই উচ্চশিক্ষায় আজ ইতিহাস, ললিতকলা, সাহিত্য, দর্শনের মতো ধ্রুপদী বিষয়গুলোর কদর কমে যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষায় এখন বাণিজ্যনির্ভর বিষয়গুলোর জয়জয়কার। তরুণেরা বাণিজ্য কীভাবে করতে হয় শিখবে। কীভাবে মুনাফা সর্বোচ্চ করা যায়? গেইম থিউরির মতো ধারনাগুলো শিক্ষাই তাদের প্রধান কাজ। ললিতকলা, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য চর্চা তাদের কাছে গুরুত্বহীন, অসার। যেভাবেই বিবেচনা করি না কেন যেকোনো বাণিজ্য শুরু হয় মিথ্যা দিয়ে। আর এ মিথ্যা শিক্ষা দিয়ে শিক্ষার নামে প্রকৃত অর্থে তরুণদের বিপথগামী করা হচ্ছে। সঙ্গত কারণেই মানুষের মেধা-মনন আজ সৃজনশীল না হয়ে বরং ছলনার আশ্রয় নিয়ে কীভাবে আয়েশী দিন যাপন করা যায় সে দিকেই বেশি ধাবিত হচ্ছে। এই উপমহাদেশের সঙ্গীতাঙ্গনের দিকে তাকালেই এর সত্যতা মিলবে। বর্তমানে কত সংগীতশিল্পীই না জন্ম হচ্ছে। কিন্তু এদের কোনো একজনকে ষাটের দশকের শিল্পীর সাথে তুলনা করা যাবে কি? এ যুগের একজন শিশুর মধ্যে সংগীতপ্রতিভা দেখলেই গান গেয়ে কীভাবে অর্থবিত্তের মালিক হওয়া যায় সে চিন্তায় মা-বাবা বিভোর হয়ে যান। এতে তার শিল্পসত্তা লোপ পেতে থাকে। একজন সংগীতশিল্পীর গানের প্রতি অনুরাগ, দরদ, মমত্ববোধ থাকা বাঞ্ছনীয়। অর্থ উপার্জনের নেশা তা ধ্বংস করে দেয়। ফলে ষাটের দশকের শিল্পীর মতো শিল্পী এ যুগে সৃষ্টি হচ্ছে না। এর জন্য দায়ী বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিই।

সমাজের জন্য কিছু করতে চাইলে একজন মানুষকে ভালো মানুষ হতে হবে। একজন প্রশাসক, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদসহ যেকোনো পেশার একজন মানুষ যত দক্ষই হোক-না কেন ভালো মানুষ না হলে তার দক্ষতা ও যোগ্যতা দিয়ে দেশ ও মানুষের জন্য কিছু করতে পারে না। পরিতাপের বিষয় মানুষের কল্যাণের সাধনে অযোগ্য এই মানুষগুলোই আমাদের সমাজে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত। আমাদের দেশে যা দেখছি একজন ডাক্তার প্রতিষ্ঠিত হয়ে উচ্চ বিত্তের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে চায়। কেননা উচ্চ বিত্তের কাছ থেকে সহজে অধিক ফি আদায় করা যায়। পরম মমতার সাথে সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে এমন তো দেখা যায়না। উল্টো সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার নামে অবহেলিত হয়, উপেক্ষিত হয়। একই কথা অন্য পেশাজীবীর বেলায়ও প্রযোজ্য। এটি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের ফল। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে প্ররোচিত করে। সৎ, প্রতিশ্রুতিশীল, দায়িত্বশীল ও ভালো মানুষ হিসেবে নয়। মানুষকে নিজের জন্য পরিবারের জন্য পরিশ্রমী হতে উদ্বুদ্ধ করে। দেশ ও সমাজের জন্য নয়।

বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে এমনভাবে প্ররোচিত করে যে, সে সবকিছুই অর্থের মানদণ্ডে বিবেচনা করে। অর্থই সব। মান-মর্যাদা, আভিজাত্য সবই অর্থের মাধ্যমে নিরূপিত। মানুষের সততা, নীতিনৈতিকতা, বিবেক-বিবেচনাবোধ সব তুচ্ছ। ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ সমকাল পত্রিকার প্রথম পাতায় "ওয়াসার প্রকল্পে ব্যাপক নয়-ছয়: ২০০ কোটি টাকার সুফল পায়নি রাজধানীবাসী" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূর করার লক্ষ্যে গৃহিত ২০০ কোটি টাকার প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়মের কথা তুলে ধরা হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, এ প্রকল্পে সময় ও ব্যয় দুটোই বাড়ানো হয় নিয়মবহির্ভূতভাবে। ১১টি প্যাকেজ দরপত্র আহ্বানের কথা থাকলেও ২০০টি কার্যাদেশ দিয়ে ঠিকাদারদের সঙ্গে মিলে সরকারি প্রকল্পের অর্থ নয়ছয় করা হয়। কমপক্ষে ৮০টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের

নামে অর্থ ছাড় করা হয় কার্যাদেশের চেয়ে বেশি। দরপত্র ছাড়াই সরাসরি কয়েকটিকে কাজ দেওয়া হয়। কাজ শেষ হওয়ার আগেই বিল দেওয়া হয়। প্রকল্প এলাকায় ৫ কিলোমিটার পাইপ ক্রয় ও স্থাপন করার কথা থাকলেও তা শেষ না করেই কাজ শেষ করা হয়। ১ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের কথা থাকলেও অধিগ্রহণ করা হয় মাত্র দশমিক ৩৪ হেক্টর। সম্প্রতি প্রথম আলো পত্রিকায় "টাকা গুনে গুনে পকেটে নিলেন পুলিশ কর্মকর্তা" শিরোনামে এক প্রতিবেদনে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের ওবায়দুর রহমান নামের একজন উপ পরিদর্শক অপহরণ মামলায় জড়ানো মো. মাসুম নামের একজনের কাছ থেকে কীভাবে দফায় দফায় টাকা আদায় করছেন, তা উল্লেখ করা হয়। ২০১৫ সালের ২০ ডিসেম্বরে সাভারের আশুলিয়ায় শেখ শাওন নামের সাড়ে চার বছরের এক শিশু নিখোঁজ হয়। মো. মাসুম নামের ঐ ব্যক্তিকে আসামি করে ২০১৬ সালের ১২ মার্চ আশুলিয়া থানায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করা হয়। ওবায়দুর রহমান তদন্তকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত হলে নিখোঁজ ঐ শিশুর উদ্ধারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ না করে মামলাকে পুঁজি করে অর্থ উপার্জনের পথ বেছে নেন। নিখোঁজের বাবা শেখ সুমন প্রথমে মাসুমকে অভিযুক্ত করলেও পরে অবস্থান পাল্টায়। কিন্তু ওই কর্মকর্তার হাত থেকে মাসুমের মুক্তি মেলেনি। কলমের খোঁচায় মাসুমকে শেষ করে দেওয়ার হুমকি দিলে মাসুম ওই কর্মকর্তাকে কয়েক দফায় ২ লাখ ২২ হাজার টাকা প্রদান করে। পেশায় ইলেকট্রেশিয়ান মাসুম এত টাকা পরিশোধ করে নিঃস্ব হয়ে যায়। অর্থ উপার্জনের নেশায় মানুষ কত সহজে নিজেকে ছোট করে, কত সহজে নিজের মনুষ্যত্ব, আত্মমর্যাদা, মানসম্মান বিসর্জন দিতে পারে। অর্থ উপার্জনের নেশায় সত্যিই নীতিনৈতিকতা, আইন, বিবেক বিবেচনা, দেশ ও গণমানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করা হয় না। চিন্তা করার কোনো সুযোগও নেই। যেকোনো উপায়ে, যেকোনো পথে অর্থ উপার্জন চাই-ই চাই। বৈধ অবৈধ বিবেচ্য নয়। নীতিনৈতিকতার প্রয়োজন নেই। অর্থই চাই। চাই-ই চাই। ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ প্রথম আলোর 'পাকা বাড়িতে ভিজিডির কার্ড' শিরোনামে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় 'অন্যের জমিতে খুপড়িঘরে সংসার তানজিলা বেগমের। স্বামী জালাল উদ্দিন দিনমজুর। তাও ভিজিডি কার্ড জোটেনি তানজিলার কপালে। তাদের প্রতিবেশী শামসুল ইসলাম অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ। পাকা বাড়ি। তার ছোট স্ত্রীর নামে ভিজিডি কার্ড বরাদ্দ হয়েছে। রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার ভানুগাছি ইউনিয়নে তানজিলার মতো কেউ কেউ ভিজিডি কার্ড পাননি। আবার শামসুল ইসলামের মতো বেশ কয়েকটি পরিবারের সদস্যরা ওই কার্ড পেয়েছেন।' ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ কালের কণ্ঠ পত্রিকার একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'সামাজিক সুরক্ষা খাতের উপকারভোগী নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম।' এতে উল্লেখ করা হয় সরকারের গৃহিত সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা খাতের ৮৪ শতাংশ উপকারভোগী নির্বাচনে অনিয়মের ঘটনা ঘটছে। এসব ঘটনা কী প্রমাণ করে? অর্থলিপ্সা মানুষকে পরিপূর্ণ অমানুষ করে তোলে।এসব প্রতিবেদনে প্রমাণিত হয়েছে, অর্থ উপার্জনের নেশায় মানুষ নিজেকে কত ছোট করতে পারে। সামান্য চোখ বুঝেই আঁচ করা যায়। অর্থলিপ্সার কাছে মানবতার ন্যূনতম কোনো মূল্য নেই। মনুষ্যত্ববোধ, মায়ামমতা সবকিছুই তুচ্ছ, অবহেলিত।

মানুষকে ঠকিয়ে বা বঞ্চিত করে, প্রতারণা করে, শঠতা, কপটতার বিনিময়ে বিপুল অর্থবিত্তের মালিক হওয়ার শিক্ষা মূলত বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই পাওয়া। এ শিক্ষা থেকে কোনো উন্নয়ন হতে পারে এটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। সমাজের যত অস্থিরতা, অশান্তি, অনিয়ম সবই এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উদ্ভূত। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে সাংস্কৃতিক বিভেদ, ভেদাভেদ, ব্যবধান, বৈষম্য গড়ে তোলে। আমাদের দেশে বিদেশিদের নিরাপত্তার জন্য কত কিছুই না করা হচ্ছে। বিশেষ করে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে ঢাকার গুলশানে ইতালির নাগরিক সিজার তাভেলা এবং একই সপ্তাহে ৩ অক্টোবর রংপুরের কাউনিয়ায় জাপানের নাগরিক হোশি কোনিও হত্যার পর বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তার বেশকিছু নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য এসকল পদক্ষেপ

নিসঃন্দেহে প্রশংসনীয়। প্রশ্ন হলো একজন ইউরোপীয় নাগরিকের নিরাপত্তার জন্য আমাদের দেশে যা করা হচ্ছে, সে দেশে অবস্থানরত আমাদের দেশের কোনো নাগরিকের নিরাপত্তার জন্য তা করা হচ্ছে কি না? নিশ্চয়ই না। খালি চোখে যা দেখি বিভিন্ন কারণে ইউরোপীয় নাগরিকগণ এ দেশে এসে থাকেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা, ইংরেজি শিক্ষা, খেলোয়ার, বিভিন্ন খেলার কোচ, বিশেষজ্ঞ, এনজিও, বহুজাতিক কোম্পানির কর্মী, দূতাবাসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করতে এসে দেশের বিভাগীয় শহর, জেলাশহর এমনকি গ্রামগঞ্জেও গিয়ে থাকেন। মানুষের আথিতিয়তা দেখে তারা মুগ্ধ হন, বিমোহিত হন। উল্টোভাবে দেখলে আমাদের দেশেরও অনেক মানুষ বিভিন্ন কারণে ইউরোপীয় দেশগুলোতে যান। সেখানে কি তারা এমন আথিতিয়তা পান? নিশ্চয়ই না। আথিতিয়তার বদলে বরং বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার হন। বিশেষ করে এসব দেশে কর্মরত শ্রমজীবী মানুষেরা ব্যাপকভাবে অবহেলিত হয়ে থাকেন। এ সাংস্কৃতিক বৈষম্য বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উদ্ভব। আমাদের দেশসহ অনেক দরিদ্র দেশের শ্রমিকেরা মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে কাজ করছেন। এসব শ্রমিকের অধিকাংশই তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, অবহেলিত হচ্ছেন। আবার পান থেকে চুন খসলেই তাদের কঠোর শাস্তির মুখোমুখী হতে হচ্ছে। এই শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ত্রুটি রাষ্ট্রীয়ভাবে কূটনীতিতে প্রভাব পড়ছে। ভাবমূর্তির সংকটে পড়ছে পুরো দেশ। অথচ ধনী দেশগুলোর নাগরিকগণ অনেক অনাচার-অপকর্ম করে চলছে, তাতে সরকারের ন্যূনতম ভ্রুক্ষেপ নেই। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ ও দায়বদ্ধতার চেয়ে কোম্পানি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, গণমাধ্যম, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো মুনাফার প্রতি ঝুঁকে থাকে। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির এটাই মূল শিক্ষা। প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দেশ ও মানুষের প্রতি যে দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা আছে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির মায়াজালে পড়ে এ বিষয়টি অস্বীকার করে কেবল অর্থ ও মুনাফার পেছনে ছুটে থাকে। বিশ্বব্যাপী আজ অসংখ্য আন্তর্জাতিক সংস্থা সক্রিয়। মানবাধিকার, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি প্রতিরোধ, দারিদ্র্য বিমোচন, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, সুশাসন, টেকসই উন্নয়ন ইত্যাদি লক্ষ্য নিয়ে এসব সংস্থা গড়ে উঠছে। এসব সংস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে কার্যক্রমের কোনো মিল নেই। তারা দরিদ্র দেশগুলোর দরিদ্র মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের চাইতে ধনী দেশের অর্থলিপ্সু কোম্পানিগুলোর মুনাফা লাভের পথ সুগম করার জন্য ব্যতিব্যস্ত। কাগজে-কলমে সুন্দর সুন্দর কথা বলে থাকলেও বাস্তবে তাদের জন্ম ধনী দেশগুলোর লুণ্ঠনের অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত করা—বাণিজ্যতন্ত্রকে প্রসারিত করা। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আজ কত অসহায়। গণমাধ্যমের বদৌলতে তাদের দুর্দশার চিত্র যা দেখি তা থেকে বলতে পারি এ যুগে মানবতা বলতে কিছু আছে বলে মনে হয় না। রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর পদক্ষেপ দেখে হতবাক হতে হয়। রোহিঙ্গাদের পক্ষ নিয়ে অনেক সংস্থা কথা বলছে, পাশে দাঁড়ানোর কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এ সমস্যা স্থায়ী সমাধানের কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। বিষয়টি উদ্ভট নয় কি?

বাণিজ্যতন্ত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হলো শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে লিখে মানুষকে প্রভাবিত করা, প্ররোচিত করার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া। আগে একটি বই মানুষকে আলোড়িত করত। বাণিজ্যতন্ত্র বিকাশের ফলে মানুষের কথা বলে, মানবিকতার কথা বলে এমন লেখা বই মানুষকে প্রভাবিত করে না। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, মাতা, মাতৃভূমি আর মাতৃভাষা এই তিনটি মানুষের কাছে পরম শ্রদ্ধার বস্তু। চরিত্র গঠন, ভালো মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠার উপদেশ এখন আর মানুষকে তেমন উদ্বুদ্ধ করে না। মননশীল মানসিকতা, সৃজনশীলতা ক্ষয়ে আসছে ক্রমশ। ডা. লুৎফর রহমানের মহৎ জীবন, উন্নত জীবন বইগুলোর মতো বইয়ের কদর ও গুরুত্ব দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। স্বাধীন মত প্রকাশের

সংস্কৃতিতেও বাণিজ্যিকপ্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ যুগে মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত বলা হলেও এখন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রায় সবাই সতর্ক থাকে। ইংরেজি সাহিত্যের মহাকবি জন মিল্টন আজীবন অনাচারের বিরুদ্ধে লিখে গেছেন। ১৬৪৪ সালের ২৩ নভেম্বর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Areopagitica প্রকাশিত হয়। বাক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে এই গ্রন্থ রচনা করার আগে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তার ওপর অত্যাচার, নির্যাতন এমন কি মৃত্যুর হুমকিও আসতে পারে। কিন্তু এই গ্রন্থ রচনা করতে পিছপা হননি। ১৬৪৩ সালে রাজার নির্দেশে 1643 Ordinance for the Regulation of Printing এর মাধ্যমে বাক স্বাধীনতা, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক বিষয়ে লেখার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হলে মুদ্রণ ও বাক স্বাধীনতার পক্ষে জন মিল্টনের লিখা এই বিখ্যাত গ্রন্থ শুধু ইংল্যান্ডে নয়, সমগ্র বিশ্বের মানুষের বাক স্বাধীনতা, মুদ্রণ স্বাধীনতা সংগ্রামের এক জীবন্ত দলিল। আমাদের দেশে ব্রিটিশ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে যারা কলম ধরেছেন, তারা নির্যাতিত হয়েছেন। আবার ব্রিটিশদের তোষণ করে যারা লিখেছেন তারা পুরস্কৃত হয়েছেন, পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন। দীনবন্ধু ছিলেন মাটির কাছাকাছি মানুষ। তিনি ছিলেন কৃত্রিমতার বিরোধী এবং সত্যের অনুসারী। ব্রিটিশদে রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তাঁর মতো মানবহিতৈষী মননশীল ব্যক্তি সাধারণ মানুষের পক্ষে লিখেছেন। মমতাজউদ্দীন আহমদ তাঁর সম্পাদিত দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের নীলদর্পণ পাঠের ভূমিকায় লিখেছেন, নীলদর্পণের রাজনৈতিক ভাগ্য দীনবন্ধু আঁচ করেছিলেন, কিন্তু সেন্টিমেন্ট উত্তেজনাকে শ্রদ্ধা করতেন বলে নীলদর্পণ প্রকাশে সংকুচিত হননি। বিবেকের নির্দেশে 'নীলকর-বিষধরদংশন-কাতর' নানা স্থলের পথিক সরকারি কর্মচারী দীনবন্ধু নীলদর্পণ প্রকাশ করে মহৎ সাহসের কাজ করেছিলেন। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ন্যায়ের প্রশ্নে কোনো দিন আপস করেনি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি বিদ্রোহী কবি এবং আধুনিক বাংলা গানের জগতে বুলবুল নামে পরিচিত। জেল-জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন করেও তাকে সত্য বলা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তিনি আজীবন অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে ও সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কথা বলেছেন। এ যুগের বুদ্ধিজীবীরাও সত্য কথা বলেন। কিন্তু এ সত্য বলেন মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, আপসের মনোভা থেকে। গুছিয়েগাছিয়ে এমন কৌশলে সত্য বলেন, যাতে সব পক্ষই খুশি হয়। যাতে সব পক্ষ থেকে সুযোগ বোঝে সুবিধা নেওয়া যায়। একজন উপন্যাসিক উপন্যাস লেখার আগে চিন্তা করেন, কোনো কোনো শব্দ কীভাবে স্থাপন করা হলে তার গ্রন্থটি বেশি বিক্রি হবে। সুতরাং সত্যিকার অর্থে এটি স্বাধীন মত প্রকাশ নয়। সত্য হলো—দিন যতই যাচ্ছে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের মানুষের সংখ্যা কমে আসছে।

ব্যাংকিংব্যবস্থার প্রবর্তন ও উন্নয়ন পৃথিবীতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। ব্যাংকিংব্যবস্থায় প্রযুক্তির সংযোগ করে আধুনিক কালে আরও যুগোপযোগী করে মানুষের জীবনকে গতিশীল, স্বাচ্ছন্দ্যময় করে গড়ে তোলছে। কিন্তু এ ব্যাংকিংব্যবস্থায় বিশ্বব্যাপী গণমানুষের কোনো উন্নয়ন করতে পেরেছে কি? প্রশ্ন আছে এ নিয়ে। আধুনিক ব্যাংকিং বাণিজ্যবাদকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গণমানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন তথা প্রকৃত টেকসই উন্নয়নে কোনো ভূমিকা নেই। আমাদের দেশে যা দেখে চলছি, ব্যাংকগুলো কেবল স্বচ্ছল ব্যবসায়ী শ্রেণি, যাদের অঢেল সম্পদ আছে কেবল তাদেরই মোটা অংকের ঋণ প্রদান করে আসছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, কৃষক, শ্রমজীবী দরিদ্র সাধারণ মানুষের জন্য ব্যাংকিং করতে তেমন আগ্রহী নয়।

বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি সত্যকে আড়াল করে রাখে। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে আমরা পৃথিবীতে ব্যাপক উন্নয়ন লক্ষ করি। শিক্ষা, অবকাঠামো, মানবসম্পদ উন্নয়নসহ অর্থনৈতিক সামাজিক উন্নয়নে দ্রুত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। এর নেপথ্য কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নয়ন। সত্যি কি তাই? জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমরা কি সত্যিই এগিয়ে যাচ্ছি? মানব পাচারের কথাই বিবেচনা করি। বিশ্বব্যাপী মানব পাচার

আজ এক ভয়াবহ সমস্যা। অমানবিক হলেও দিন দিন বেড়েই চলছে মানব পাচারের পরিমাণ। গত ২৭ জুলাই, ২০১৫ তারিখে United states Department of Stateকর্তৃক প্রকাশিত 2015 Trafficking in Persons Report —Bangladesh নামে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় "Bangladesh is primarily a source and tolesserextent a transit and destination country for men, women and children subjected to forced labor and sex trafficking."। ২৪ জুলাই ২০১৫ তারিখে সমকাল এ প্রকাশিত "সীমান্তের অনেক কর্মকর্তা মানব পাচারে জড়িত" শিরোনামে এক প্রতিবেদনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র থেকে উল্লেখ করা হয়, কক্সবাজারের টেকনাফ, উখিয়াসহ সীমান্ত এলাকায় ঘুরে-ফিরে পোস্টিং নেওয়া কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মানব পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। এসব কর্মকর্তার বদলি করা হলেও তদবির করে ওই এলাকায় থেকে যায়। মানব পাচারকারীদের সাথে এসব কর্মকর্তার সাথে বিশেষ সখ্য রয়েছে এবং রাতারাতি বিপুল অর্থের মালিক বনে গেছে তারা। বিশ্বজুড়ে নারী, শিশু, মানবপাচার উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। এমন অবস্থায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে যাচ্ছি দাবি করা যৌক্তিক হবে কি? তবে কি মানব পাচার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব। হয় তো সম্ভব নয়। কিন্তু মানবপাচার দিনে দিনে না বেড়ে ক্রমান্বয়ে তা কমার কথা। তাহলেই কেবল আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে যাওয়ার দাবি যৌক্তিক বলা যাবে।

একজন রাষ্ট্রনায়ক হবে মানবতাবাদী, মানবকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ। একই সাথে পরমতসহিষ্ণু, উদার, অসাম্প্রদায়িক, পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় নিরলস কর্মী। কিন্তু বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে বিচিত্র সব ঘটনা ঘটে চলছে। পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ছড়িয়ে, উগ্র, সাম্প্রদায়িক, বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতি হুমকি তৈরি করে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলোতে জনগণের রায় নিয়ে রাষ্ট্রনায়ক বনে যাচ্ছে। এ থেকে কি বলতে পারি বিশ্ব সত্য সত্যিই জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে যাচ্ছে? গত ৩১ জুলাই, ২০১৫ রাত ১২টা ১ মিনিটে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার ৬৮ বছরের পুঞ্জিভূত ছিটমহল সমস্যার অবসান হয়। আমরা দেখছি আন্তরিকতা থাকলে কত দ্রুত কত সহজে ছিটমহল সমস্যার মতো সমস্যা সমাধান করা যায়। প্রশ্ন হলো বিগত ৬৮ বছর ধরে এ সমস্যা কেন টিকে থাকে? কীভাবে টিকে থাকে? এর আগে গেলে ছিটমহল সমস্যার উদ্ভব হলো কেন? আমরা যে দাবি করছি আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে যাচ্ছি। ৬৮ বছরের ছিটমহল সমস্যা কি প্রমাণ করে দেয় আমরা সত্যি-সত্যিই এগিয়ে যাচ্ছি? মধ্যপ্রাচ্য সংকটের দিকে তাকালে কী দেখি? ১৯৯০ সালে দ্বি-মেরভিত্তিক বিশ্ব থেকে এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের মধ্য দিয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পরপরই মার্কিনপন্থী ইরাক সরকার মার্কিন সরকারের চক্ষুশূলে পরিণত হয়। কালবিলম্ব না করে মার্কিন সরকার ইরাক আক্রমণ করে। পরে মার্কিন সরকারে পরিবর্তন এলে ইরাকের ওপর আক্রমণ বন্ধ হয়। ২০০১ সালে ১/১১-এর পর মার্কিন জোট আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া প্রভৃতি দেশে সরাসরি আক্রমণ চালিয়ে চরম অশান্তি ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে। শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে মূলত মার্কিন জোট পাকিস্তান থেকে শুরু করে আফ্রিকার প্রায় পুরো অংশের কোটি কোটি মানুষকে জিম্মি করে রেখেছে। সাদ্দাম-গাদ্দাফিদের অনেক দোষ ছিল সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হলো সাধারণ মানুষের মুক্তি, গণতন্ত্র, সুশাসন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে মার্কিন জোট এসব দেশে আক্রমণ চালালে সাধারণ মানুষের আদৌ কোনো উন্নতি হয়েছে কি? সাদ্দামের আমলে ইরাকের সাধারণ মানুষ শান্তিতে ছিল, নিরাপদে ছিল, ইরাক ছিল সমৃদ্ধশীল দেশ। একই কথা গাদ্দাফির আমলের লিবিয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আজকের বাস্তবতায় কেবল ইরাক, লিবিয়ার জনগণ নয় বিশ্বের এক বিশাল এলাকার সাধারণ মানুষ এখন চরম দুর্দশায় নিমজ্জিত। এ অঞ্চলের কোটি কোটি নারী ও শিশুর ভবিষ্যৎ এখন চরম অন্ধকারে। এটা কি প্রমাণ করে আমরা প্রকৃত অর্থে এগিয়ে

যাচ্ছি। বিশ্বব্যাপী এ রকম হাজারও সংকট তৈরি হচ্ছে, জিইয়ে রাখা হচ্ছে; যেগুলো মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়। সুতরাং জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি না। সত্য হলো বিশ্বব্যাপী সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী সাধারণ কৃষক, মজুর, কুলিদের সৃষ্টি করা সম্পদ কতিপয় মানুষ কুক্ষিগত করে বিলাসবহুল জীবনযাপন নিশ্চিত করছে। বাণিজ্যতন্ত্র এটাকেই উন্নয়ন বলছে। বাণিজ্যতন্ত্র এটাকেই বলছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার। সত্যকে আড়াল করার এ যেন এক ভয়াবহ অপকৌশল।

বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার উন্নত দেশগুলোর মুষ্টিমেয় মানুষের সীমাহীন বিলাসী জীবন যাপন উৎসাহিত করছে। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের দুর্ভোগ, দুর্গতি বাড়ুক—সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। তাদের দুর্দশার কথা বলা হয় সত্য। তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে কোনো উন্নয়ন হয় না। দিন রাত পরিশ্রম করেও এসব দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ দুবেলা ভাত খেতে পারে না—সেদিকে খেয়াল দেওয়ার সময় কোথায়? বাণিজ্যি দৃষ্টিভঙ্গি তাই চতুর একচোখা। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি সময়ের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করছে। মানবসভ্যতার অগ্রগতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ করে চলছে। পৃথিবীর সত্যিকার উন্নয়নে বাণিজ্যিকতার ভেরাজাল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

প্রতিটি মানুষই স্বচ্ছলতা চায়। পরিবার পরিজন নিয়ে স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপন করার প্রবণতা মানুষের একটি স্বাভাবিক সহজাত প্রবৃত্তি। একজন যৌক্তিক মানুষ স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপনের প্রত্যাশা করতেই পারে। কিন্তু সে স্বচ্ছলতা প্রাপ্তির জন্য মানুষের মেধা, সৃজনশীলতা, পরিশ্রমের সমন্বয় চাই। মানুষ তার যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা, সততার বিনিময়ে সুন্দরভাবে স্বচ্ছল জীবন যাপন করতে পারে। রাষ্ট্র-সমাজ তথা মানুষের উচিত সে রকম একটি অবস্থান তৈরি করা। সৎভাবে অর্থ উপার্জন করে স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপনের প্রতি সবারই সমর্থন থাকা উচিত। পরিতাপের বিষয় হলো—বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি এ সত্যকে অস্বীকার করে। বাণিজ্যতন্ত্রে সততা, মেধা, যোগ্যতার কোনো স্থান আছে বলে মনে হয় না। বাণিজ্যতন্ত্রে যেকোনো উপায়ে অর্থ উপার্জন চাই। নীতিনৈতিকতা, সততা, বিবেক বিবেচনা বোধ, মনুষ্যত্ববোধের ধার ধারে না। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি আজ এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্র নামধারী রাষ্ট্রগুলো নীতিনৈতিকতাবহির্ভূত বেআইনি-গর্হিত অন্ধকার পথে অর্থ উপার্জন ঠেকাতে পারছে না। বিশ্বব্যাপী আজ কালো টাকার দাপট। ৫ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে সমকাল পত্রিকার পানামা পেপারস' নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে উল্লেখ করা হয়, পানামার একটি ল ফার্ম মোসাক ফনসেকার ১ কোটি ১৫ লাখ গোপন নথি ফাঁস হওয়ার পর বিশ্বজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। পানামা পেপারস' খ্যাত ওই নথিগুলোতে জানা গেছে, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতা থেকে শুরু করে ধনী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তি, নামীদামি চলচিত্র অভিনেতা, খেলোয়াড়রা কৌশলে কর ফাঁকি দিয়ে বিদেশে গোপনে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। এ তালিকায় বর্তমান ও সাবেক মিলিয়ে অন্তত ৭২ জন রাষ্ট্রপ্রধানের নাম প্রকাশ পায়। পানামা পেপারস থেকে কালো টাকার বিস্তৃতি সম্পর্কে একটি সামান্য ধারণা পাওয়া যায় মাত্র। মোদ্দা কথা, সৎ পথে থেকেও মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করে দেশ ও সমাজের বিঘ্ন না ঘটিয়েও কাড়ি কাড়ি অর্থ উপার্জন করা যায়। প্রচুর বিত্ত-বৈভবের মালিক হওয়া যায়। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি তা পরিহার করে বরং অবৈধ ও অনৈতিক উপায়ে অর্থ উপার্জনকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এককথায় বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি একজন মানুষকে পরিপূর্ণ অমানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

বিজ্ঞানের হাজারও আবিষ্কার মানবকল্যাণে কাজে লাগানোর সুযোগ আছে। বিজ্ঞানীরা মানুষের কল্যাণের কথা ভেবেই তাঁদের মেধা ও মননের সর্বোত্তম ব্যবহার করে নিরলস পরিশ্রম করে বিভিন্ন আবিষ্কার করে

চলেছেন। কিন্তু এসব আবিষ্কার হয়ে উঠছে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মুনাফা লাভের হাতিয়ার। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির কাছে মানবকল্যাণ আজ ভূলুণ্ঠিত। মানুষের শৈল্পিক সত্তা উপেক্ষিত। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি আজ এক প্রবল প্রতাপশালী দর্শন, সর্বগ্রাসী সংস্কৃতি যার কাছে গোটা বিশ্ব নতজানু, অসহায় অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। বাণিজ্যিকতার অন্ধকার রূপ দেখে বিশ্ব বিবেক বাক্‌রুদ্ধ, হতবাক। সভ্যতা সবকিছুই দেখছে, শুনছে, বুঝে চলছে- কিন্তু কিছুই করতে পারছেনা- যেন কিছুই করার নেই।

৬. প্রয়োজন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসার

প্রশ্ন হলো—এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? এ থেকে পরিত্রাণের উপায় হলো মানবিক শিক্ষার প্রসার। বাণিজ্যিকতার কবল থেকে গোটা বিশ্বকে তথা বিশ্ববাসীকে রক্ষা করার প্রত্যয়ে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারে সবার আগে বিশ্বনেতৃত্বকে একত্রে বসতে হবে। কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক তথা পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনে বাণিজ্যিক স্বার্থ থাকবে। এতে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে মানবিকতাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা, রাজনীতি, আইনপ্রণয়ন থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে সব স্তরে মানবিকতাকে প্রধান্য দিতে হবে।

বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, বিশ্বব্যাপী শিক্ষা হবে মানবিকতাকে পাকাপোক্ত করার হাতিয়ার। বাণিজ্যিক শিক্ষাকে পরিত্যাগ করে মানবিক শিক্ষা বিশ্বব্যাপী গ্রহণ করা গেলেই কেবল প্রকৃত উন্নয়ন তথা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। শিক্ষার মানবিকীকরণ করতে হবে। শিক্ষাকে মানবিক করে অর্থনীতি, রাজনীতি, কূটনীতিকে মানবিকীকরণ করা সহজ হবে এবং বিশ্বব্যাপী বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব। বিশ্বব্যাপী মানবিক শিক্ষার প্রসারের ফলে কী কী পরিবর্তন আনা সম্ভব—অনুমান করি:

১. সারা বিশ্ব থেকে দুর্নীতি সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব।

২. দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজটি খুব সহজে অনায়াসেই প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

৩. অসুস্থতা, অসহায়ত্ব, অপুষ্টি, ক্ষুধা, শোষণ-বঞ্চনামুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করার কাজটি সহজতর হবে।

৪. প্রতিটি দরিদ্র, শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন বা স্বচ্ছল ও নিরাপদ জীবনযাপন সম্ভব হবে।

৫. শিক্ষাকে মানবিক করা সম্ভব হলে বর্তমানে যে উন্নয়ন বিশ্বব্যাপী দৃশ্যমান, তার চেয়ে সহস্রগুণ উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে।

৬. গণমুখী ব্যাংকিংব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হবে। এতে বিশ্বব্যাপী ব্যাংকিংব্যবস্থা জণকল্যাণে মুনাফার কথা বাদ দিয়ে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে। অনুরূপ গণমাধ্যম কর্পোরেট পুঁজির কবল থেকে মুক্ত হবে। গণমাধ্যমও সত্যিকার অর্থে বিশ্বব্যাপী অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে। গণমাধ্যম কাঠামো এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে, যাতে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কী ঘটছে, সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলো কী, তাদের সম্ভাবনা তথা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে—এমন খবর প্রচারে প্রধান্য পায়। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিনোদন বিষয়গুলো শতভাগ ব্যয়মুক্ত করা যাবে।

৭. মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি ভিত্তি করে সারা পৃথিবী থেকে দুর্নীতি, দারিদ্র্য, অত্যাচার, অনাচার প্রায় শতভাগ দূর করা সম্ভব।

৮. সব উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হবে জনস্বার্থে। জনস্বার্থ নিশ্চিত করেই তবে মুনাফার প্রশ্ন আসবে। লাগামহীন মুনাফা অর্জনের অপসংস্কৃতি থেকে উৎপাদক শ্রেণি বেরিয়ে আসবে। পৃথিবীতে

ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অপুষ্টি সংঘাত বলে কিছু থাকবে না। বৈষম্য, বিভেদ, হানাহানি, অনাচার, অরাজকতা দূর হবে।

৯. অর্থনীতিকে মানবিক করা সম্ভব হবে। গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে বাণিজ্যিকতা বলতে কিছু থাকবে না। সব দেশের সব অর্থনীতিতে থাকবে মানবিকতার জয়জয়কার। এ জন্য মুনাফা সর্বোচ্চকরণ তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে। মানবকল্যাণে তথা দেশ ও মানুষের স্বার্থে উৎপাদন সর্বোচ্চকরণ তত্ত্বে ফিরে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। একই সাথে বিশ্বব্যাপী রাজনীতি ও কূটনীতিতে পরিবর্তন আসবে। দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক যা-ই বলি না কেন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে মূল কথা হবে মানবতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি। বিশ্বরাজনীতি ও কূটনীতিকে মানবিক করে পৃথিবীকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

১০. পৃথিবীর প্রতিটি নাগরিকই স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপন করতে পারে এ রকম একটি বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপন মানে বিলাসিতা নয়। চাহিবামাত্রই যেন প্রত্যেকেই তার মৌলিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিনোদন নিশ্চিত করতে পারে এ রকম একটি অবস্থান তৈরি করা।

১১. পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে শিক্ষিত, সচেতন, মানবতাবাদী, উদার, অসাম্প্রদায়িক, সংস্কৃতিমান এক পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। প্রতিটি মানুষকে সংস্কৃতিমান হিসেবে গড়ে তোলতে সক্ষম হলেই পৃথিবী থেকে সব অনাচার দূর করা সম্ভব।

এমন একটি ব্যবস্থা চালু করার পথে প্রধান বাধা বাণিজ্যিকতা। এই বাণিজ্যিকতাই বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের মুক্তির কথা না ভেবে মুষ্টিমেয় মানুষের বিলাসী জীবন নিশ্চিত করতে চায়। টেকসই প্রকৃত উন্নয়নে এমন সংস্কৃতির অবসান হওয়া সময়ের দাবি। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই এক-একজন সুবিবেচক নাগরিক। এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠার নিরন্তর, দুর্বার, অপ্রতিরুদ্ধ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। পৃথিবীর প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষা-স্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে সবার আগে আগে চাই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ উন্নয়ন, মানবাধিকার, সুশাসন, আইনের শাসন, শোষণমুক্ত, দারিদ্র্য মুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়তে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা আজ বড় প্রয়োজন।

৭. শেষ কথা

সুতরাং উন্নয়ন কেবল বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে বিবেচনা কাম্য নয়। আজ সময় এসেছে এ বিষয়ে চুলচেঁড়া বিশ্লেষণ করার। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি আজ বিশ্বমানবতার শত্রু। বাণিজ্যিকতা আজ আমাদের এক ঘন অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। পৃথিবীতে সত্যিকার উন্নয়ন সাধন করতে হলে, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চাইলে আমাদের পরিশোধিত হতে হবে। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে মানবিকতার কথা ভাবতে হবে। বিশ্বশান্তি, মানবতা, গণমানুষের কল্যাণ তথা একটি বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ার প্রত্যয়ে আজ আমাদের বাণিজ্যিকতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি সংকুচিত হোক। পৃথিবীর সর্বত্র জ্ঞান ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হোক। আমাদের ব্রত হোক মানবতার।

তথ্যসূত্র

1. Jalil, M. A.: Bangladesh Economy in a Globalization World, BANGLADESH JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY, vol 28, Number 1, June 2012.
2. Lee, Eddy and Marco Vivarelli, The Social Impact of Globalization in the Developing Countries, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of labor, January, 2006.
3. Marching towards Growth, Development and Equitable Society, Budget Speech, 2016-17, Ministry of Finance, Peoples Republic of Bangladesh, 02 June, 2016.
4. Internet.
5. United States Department of state: Trafficking in Persons Report, Bangladesh, 27 July, 2015.

৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৬।

৭. দীনবন্ধু মিত্র, নীলদর্পণ, সম্পাদনায় মমতাজউদদীন আহমদ, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ২০০৫।

৮. বারকাত, আবুল: "বাংলাদেশে দারিদ্র্য- বৈষম্য-অসমতা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির সন্ধানে", লোকবক্তৃতা ২০১৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সিনেট অডিটোরিয়াম, ঢাকা, ২২ মার্চ, ২০১৪।

৯. বাংলা পিডিয়া (খণ্ড ২): বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ, ২০০৩।

১০. বাংলা পিডিয়া (খণ্ড ৪): বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ, ২০০৩।

১১. সমকাল, ইত্তেফাক, কালের কণ্ঠ, প্রথম আলোসহ বিভিন্ন দৈনিকের বিভিন্ন প্রতিবেদন, কলাম, ফিচার।